ইউনিট ৫
বাক্যতত্ত্ব

পাঠ ৫.১ : বাক্যের ধারণা ও সংজ্ঞার্থ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাক্যের সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
- বাক্য রচনার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা:

বাক্য ভাষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। একাধিক শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করলেই বাক্য হয় না। বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেই তা বাক্যের পর্যায়ে পড়ে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে বাক্যের সংজ্ঞার্থ প্রদান করেছেন এভাবে: "একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।"

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।"

তাহলে বাক্যের সংজ্ঞার্থ এভাবে দেওয়া যায় যে, অর্থবোধক একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে বাক্য বলে।

সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তা উহ্য থাকতে পারে। যেমন: যাও। খাও। শব্দগুলো গঠনের দিক থেকে একটিমাত্র শব্দের বাক্য হলেও এগুলোতে একাধিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

যাও। বাক্যের অন্তর্নিহিত রূপ– তুমি যাও।

খাও। বাক্যের অন্তর্নিহিত রূপ– তুমি খাও।

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যের প্রধান অংশ থাকে দুটি। একটি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়।

উদ্দেশ্য: বাক্যে যাকে লক্ষ্য করে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন- মেয়েটি পড়ছে। প্রদত্ত বাক্যে মেয়েটি উদ্দেশ্য। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে একাধিক পদও থাকতে পারে। যেমন-

'সালমা, আরিফ, রিতা স্কুলে যায়।'

এখানে 'সালাম', 'আরিফ' ও 'রিতা' এই তিনটি পদ বাক্যের উদ্দেশ্য।

বিধেয়ঃ বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন– ছেলেরা খেলছে। প্রদত্ত বাক্যে 'খেলছে' বিধেয়। বাক্যের বিধেয় অংশের মূল হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া। তবে অনেক সময় একাধিক ক্রিয়াও বিধেয় অংশে থাকতে পারে। যেমন- রহিম যেতে পারবে না।

প্রদত্ত বাক্যে 'যেতে পারবে না' বিধেয়।

বাক্য দীর্ঘ হলে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়। যেমন-

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ কৌশল	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
বিশেষণ যোগে	কুখ্যাত	জঙ্গি বাহিনী	ধরা পড়েছে।
সম্বন্ধ পদ যোগে	রহমানের	ভাই	এসেছে।
সমার্থক বাক্যাংশ যোগে	যারা সাধক	তারাই	সফল হবে।
অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	করিম সাহেব	থাকেন।
বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	যার কথা তোমরা প্রায়ই বলে থাক	তিনি	এসেছেন।

বিধেয় সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ কৌশল	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	কচ্ছপ	ধীর গতিতে	চলে।
ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
কারক সহযোগে	আমি	ভুবনের ঘাটে ঘাটে	ভাসছি।
ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	তারা	যেভাবেই হোক	যাবেন।
বিধেয় বিশেষণ যোগে	তারিন	অতি সুন্দর	গান গায়।

সার্থক বাক্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্যঃ

একটি বাক্যকে সার্থক ও শুদ্ধ হতে হলে কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এগুলো হচ্ছে–

১. আকাঙ্ক্ষা

২. আসত্তি এবং

৩. যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষাঃ 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের আভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা, বাসনা। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ বলা যায়– শ্রোতার ইচ্ছা বা বাসনার নিবৃত্তি ঘটলেই সার্থক বাক্য গঠিত হয়। যেমন-

আমরা গতকাল বই মেলায়, বাক্যটিতে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না এবং শ্রোতার শোনার আকাঙ্ক্ষাও মেটে না। তাই বাক্যটি সার্থক নয়। কিন্তু 'আমরা গতকাল বইমেলায় গিয়েছিলাম' বাক্যটিতে বক্তার মনোভাব ও শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটেছে। তাই বাক্যটি সার্থক।

২. আসত্তি : আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলি এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক থাকে এবং ভাষার নিয়ম অনুযায়ী নৈকট্য থাকে। যেমন- যাব আমি ভাত কলেজে খেয়ে। এখানে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া অনুযায়ী বাক্যগুলো সাজানো নেই। তাই এটি সার্থক বাক্য নয়। বরং একটি সার্থক বাক্য হতে হলে তা হবে- "আমি ভাত খেয়ে কলেজে যাব।" এই বাক্যটিতে সঠিক পদবিন্যাস থাকায় এটি সার্থক বাক্য।

৩. যোগ্যতা : বাক্যের পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনের নামই যোগ্যতা। যেমন- বর্ষাকালে জলপথে নৌকা চলে। এটি একটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য। কারণ বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিল রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়- "বর্ষাকালে আকাশ পথে নৌকা চলে" তবে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ নৌকা আকাশ পথে চলে না। সার্থক বাক্যের জন্য অর্থ সংগতি বা যোগ্যতা থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্য কাকে বলে? বাক্যের কয়টি অংশ ও কী কী?

২. সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৩. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.২ : বাক্যের প্রকারভেদ ও বাক্য পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- বাক্য রূপান্তরের নিয়ম বলতে পারবেন।
- বাক্য রূপান্তর করতে পারবেন।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সার্থক বাক্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. গঠন অনুসারে বাক্য খ. অর্থ অনুসারে বাক্য।

ক. গঠন অনুসারে বাক্য :

গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা তিন প্রকার বাক্য পাই।

১. সরল বাক্য

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য

৩. যৌগিক বাক্য

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- 'রহিম প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।'

প্রতিদিন বাক্যটিতে 'রহিম' উদ্দেশ্য ও 'প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়' বিধেয়। সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত হতে পারে।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : কোনো কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকতে পারে। এই অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্র বাক্য বলে। যেমন- 'সে যদি আসে তবে আমি খাব।'

বাক্যটিতে 'সে যদি আসে' অপ্রধান খণ্ডবাক্য আর 'তবে আমি খাব' প্রধান খণ্ডবাক্য।

খণ্ডবাক্য : একাধিক বাক্য মিলে একটি জটিল বাক্য তৈরি হলে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য যদি স্বাধীন বাক্য না হয়ে অন্য কোনো বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তাকে খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'যদি তুমি আস তাহলে আমি যাব', এখানে 'তুমি আস' এবং 'আমি যাব' বাক্যাংশ দুটি খণ্ডবাক্য।

খণ্ডবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. প্রধান খণ্ডবাক্য

খ. অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য

ক. প্রধান খণ্ডবাক্য : বাক্যে ব্যবহৃত যে খণ্ডবাক্য অর্থ– প্রকাশের জন্য বাক্যের অন্য অংশের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাকে প্রধান খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'আমি জানি যে সে কাজটি করেছে।'

এখানে 'সে কাজটি করেছে' বাক্যটি প্রধান খণ্ডবাক্য। বাক্যটি এককভাবে উপস্থাপন করা হলেও এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়।

খ. অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য : বাক্যে ব্যবহৃত যে খণ্ডবাক্য তার পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশের জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাকে অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'আমি অবাক হলাম তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে।'

এখানে 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে' আশ্রিত খণ্ডবাক্য। বাক্যটি নিজেই নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থ প্রকাশের জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

জটিল বাক্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

ক. আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য

খ. সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য ও

গ. প্রতি-নির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য।

ক. আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য: যে জটিল বাক্যের আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি প্রধান খণ্ডবাক্যের আশ্রয়ে থাকে এবং প্রধান খণ্ডবাক্যের সম্পূরক রূপে কাজ করে তাকে আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'নিপা যে আসবে, তা বলা যায় না।

খ. সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য : যে জটিল বাক্যের আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের বিধেয় ক্রিয়া সংগঠনের উপর নির্ভর করে, তাকে সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'কাল যদি বৃষ্টি হয়, তবে স্কুল বন্ধ থাকবে।'

এ ধরনের জটিল বাক্যের প্রধান খণ্ডবাক্যে সাধারণত সাপেক্ষ অব্যয় 'যদি' এবং আশ্রিত খণ্ডবাক্যে 'তাহলে / তবে / না হয়' ইত্যাদি যুক্ত থাকে।

গ. প্রতি-নির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য : যখন-তখন, যা-তা, যাহা-তাহা, যার-তার, যেখানে-সেখানে, যথা-তথা ইত্যাদি প্রতিনির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করে জটিল বাক্য গঠন করলে। তাকে প্রতিনির্দেশক সর্বনাম যুক্ত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'যখন রোদ উঠল, তখন আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।'

৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা তার বেশি সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘবাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু অথবা, কিংবা, বরং তথাপি ইত্যাদি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে। সরল বাক্যের সাথে সরল বাক্য বা জটিল বাক্যের সঙ্গে জটিল বাক্য বা সরল

বাক্যের সঙ্গে জটিল বাক্য বা জটিল বাক্যের সাথে সরল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। যেমন- 'তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু তোমার সাথে যে এসেছিল সে বোকা।'

খ. অর্থ অনুসারে বাক্য:

অর্থ অনুসারে বাংলা বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

১. বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক বাক্য;
২. প্রশ্নসূচক বাক্য;
৩. আদেশসূচক বাক্য;
৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য;
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য;

তবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অর্থ অনুযায়ী বাক্যকে সাত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

১. নির্দেশসূচক বাক্য;
২. প্রশ্নবাচক বাক্য;
৩. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য;
৪. আজ্ঞাসূচক বাক্য;
৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য;
৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য;
৭. আবেগসূচক বাক্য।

নিচে এগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. বিবৃতিমূলক বাক্য :

যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা বর্ণনা নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণনামূলক বা বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন- 'ওসমান ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকারের। যথা-

ক. অস্তিবাচক বাক্য

খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. অস্তিবাচক বাক্য: যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ করে, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য বলে। যেমন- 'ভাল জিনিসের কদর বেশি।'

খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব না-বোধক অর্থে প্রকাশ করে, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমন: 'ফরিদা আজ স্কুলে যাবে না।'

২. প্রশ্নবোধক বাক্য :

যে বাক্যে কোনো ঘটনা, কাহিনি বা বক্তব্য বর্ণনায় প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমন: 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

যে বাক্য দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, অনুমতি, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন- 'দয়া করে বইটি দিন।'

৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :

যে বাক্যে বক্তার ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন- 'তুমি সাধনায় সফল হও।'

৫. আবেগসূচক বাক্যঃ

যে বাক্যে বক্তার মনের আনন্দ, বেদনা, শোক-বিষাদ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন- 'হুররে! আমরা খেলায় জিতেছি।'

৬. সংশয়সূচক বাক্যঃ

যে ধরনের নির্দেশক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সংশয়, সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে সংশয়সূচক বাক্য বলে। যেমন- 'মনে হয়, রহমান পাস করবে না।'

৭. কার্যকারণাত্মক বাক্যঃ

যে সব বাক্যে কোনো নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত প্রকাশ পায়, তাকে কার্যকরাণাত্মক বাক্য বলে। যেমন- 'যদি আমি আসতে না পারি, তাহলে তুমি চলে যেও।'

বাক্যের পরিবর্তন

বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারের বাক্যে পরিবর্তন বা রূপান্তর করার নামই বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপান্তর। তবে বাক্য রূপান্তরের সময় মূল বাক্যের সাধু ও চলতিভাষারীতি অপরিবর্তিত রাখা দরকার। যেমন-

পরিশ্রমী লোক সফলতা লাভ করে।

এর রূপান্তর হয় এভাবে- যে পরিশ্রম করে সেই সফলতা লাভ করে।

বাক্য পরিবর্তনের প্রকারভেদঃ

বাক্যের পরিবর্তনকে তিনভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা-

১. গঠনগত পরিবর্তন।
২. ভাবগত পরিবর্তন।
৩. উক্তির পরিবর্তন।

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

	বাক্য পরিবর্তন	
১. গঠনগত পরিবর্তন	২. ভাবগত পরিবর্তন	৩. উক্তির পরিবর্তনগত পবিরর্তন
সরল থেকে জটিল বাক্য	অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক	প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ
জটিল থেকে সরল বাক্য	নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক	পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ
সরল থেকে যৌগিক বাক্য	নির্দেশাত্মক থেকে প্রশ্নবাচক	
যৌগিক থেকে সরল বাক্য	প্রশ্নবাচক থেকে নির্দেশাত্মক	
জটিল থেকে যৌগিক বাক্য	নির্দেশাত্মক থেকে অনুজ্ঞাসূচক	
যৌগিক থেকে জটিল বাক্য	অনুজ্ঞাসূচক থেকে নির্দেশাত্মক	
	নির্দেশাত্মক থেকে প্রার্থনাসূচক	
	প্রার্থনাসূচক থেকে নির্দেশাত্মক	
	নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়সূচক	
	বিস্ময়সূচক থেকে নির্দেশাত্মক।	

নিচে বিভিন্ন প্রকার বাক্য পরিবর্তনের সূত্র ও উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

১। গঠনগত পরিবর্তন:

ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র।

১. সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২. বাক্য দুটির প্রথমে সম্বন্ধসূচক অব্যয় (যদি-তবে, যে-সে, যখন-তখন ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।

৩. আশ্রিত খণ্ডবাক্য ও প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হবে।

৪. বাক্য পরিবর্তিত হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমন: সরল: সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।

জটিল: যে সত্যবাদী, তাকেই সবাই ভালোবাসে।

সরল: বিদ্বান ব্যক্তিরা সম্মান পায়।

জটিল: যারা বিদ্বান, তারা সম্মান পায়।

সরল: ধনীরা প্রায় কৃপণ হয়।

জটিল: যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

সরল: আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

জটিল: তুমি সেই, যাকে আমি নিতে এসেছি।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. জটিল বাক্যকে একটি অংশে রূপান্তর করতে হয়।

২. প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরিবর্তন না করে অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে হয়।

৩. অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে সংকোচন করতে হয়।

৪. সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা সাপেক্ষ সর্বনাম পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হয়।

৫. একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

৬. বাক্য পরিবর্তন হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমন: জটিল: যখন মেঘগর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।

সরল: মেঘগর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

জটিল: সে যদি কাল আসে, তবে আমি যাব।

সরল: সে কাল এলে আমি যাব।

জটিল: যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।

সরল: মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান হয়।

জটিল: যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

সরল: রক্ষকই ভক্ষক।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র:

১. সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।

২. আশ্রিত বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়।

৩. খণ্ডবাক্যগুলোকে সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করতে হয়।

৪. বাক্যের পরিবর্তন হলেও বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যেমন: সরল: আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি।

যৌগিক : আমি বহু কষ্ট করেছি, তাই শিক্ষা লাভ করেছি।

সরল: দয়া করে সব খুলে বলুন।

যৌগিক : দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।

সরল: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

যৌগিক : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

সরল: বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই।

যৌগিক: তিনি বিদ্বান তথাপি তার অহংকার নেই।

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. বাক্য পরিবর্তন হলেও বাক্যের মূল অর্থের পরিবর্তন হয় না।

২. বাক্যটিকে একটি অংশে পরিণত করতে হয়।

৩. প্রধান খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

৪. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৫. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক ইত্যাদি অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

যেমন: যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: তুমি আসবে এবং আমি যাবো।

সরল বাক্য: তুমি এলে আমি যাব।

যৌগিক: ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।

সরল: ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।

যৌগিক: আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু বজ্রপাত হলো।

সরল: আকাশে মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হলো।

ঙ. জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র:

১. জটিল বাক্যকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।

২. সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ বিলুপ্ত হয়।

৩. খণ্ডবাক্যগুলোকে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয়।

৪. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীন বাক্যগুলো যুক্ত করতে হয়।

যেমন: জটিল: তুমি যদি না খাও তবে আমিও খাব না।

যৌগিক : তুমি খাও, নইলে আমিও খাব না।

জটিল: যদিও রামলালের বয়স কম ছিল তথাপি তার দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না।

যৌগিক : রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

জটিল: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক: বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে।

জটিল: যেহেতু দোষ করেছো সেহেতু শাস্তি পাবে।

যৌগিক: দোষ করেছো অতএব শাস্তি পাবে।

চ. যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

৩. নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে একটিকে প্রধান রেখে অন্যান্য খণ্ডবাক্যগুলোকে অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যে পরিণত করতে হবে।

৪. নিরপেক্ষ বাক্য দুটির পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ ব্যবহার করতে হয়।

যেমন: যৌগিক : মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।

জটিল : যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।

যৌগিক : তুমি ধনী কিন্তু উদার নও।

জটিল : যদিও তুমি ধনী তবু উদার নও।

যৌগিক : ধনীদের নিজেদের গরজ আছে তাই তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

জটিল : যেহেতু ধনীদের নিজেদের গরজ আছে, সেহেতু তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

২। ভাবগত পরিবর্তন

ক. অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয়যোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়া) নেতিবাচক করতে হবে।

২. হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না করতে হলে মুল অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য পরিবর্তন করতে হবে।

৩. বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হবে।

৪. প্রয়োজন মত বাক্যের অন্য শব্দকে 'না' সূচক বাক্যের প্রয়োগের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৫. 'না' বাচক ক্রিয়া ও 'না' বাচক শব্দ বা 'না' বাচক অব্যয় মিলে বাক্যের অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-সূচক ভাবটি বজায় রাখতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক : হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।

নেতিবাচক : হৈমন্তী চুপ না থাকিয়া পারিল না।

অস্তিবাচক : পাখিটা মরল।

নেতিবাচক : পাখিটা বাঁচল না।

অস্তিবাচক : এভাবে সমাজ অচল হয়ে পড়ে।

নেতিবাচক : এভাবে সমাজ চলে না।

অস্তিবাচক : অনুপমার উচিত কাজ হয়েছে।

নেতিবাচক : অনুপমার অনুচিত কাজ হয়নি।

অস্তিবাচক : বাড়িটা তারা দখল করেছে।

নেতিবাচক : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।

খ. নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয় তুলে দিতে হয়।

২. শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যে হ্যাঁ-সূচক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হয়।

৩. বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হয়।

৪. প্রয়োজন মত নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দ দ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়।

যেমন: নেতিবাচক : তারা যাবে না কোথাও।

অস্তিবাচক : তারা এখানেই থাকবে।

নেতিবাচক : আমি অন্য ঘরে যাব না।

অস্তিবাচক : আমি এ ঘরে থাকব।

নেতিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার আস্থা ছিল না।

অস্তিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার অনাস্থা ছিল।

নেতিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।

অস্তিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

গ. নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. নেতিবাচক বাক্যের না-সূচক শব্দ তুলে দিতে হয়।

২. মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।

৩. নির্দেশক বাক্য হলে 'কি' এবং নঞর্থক বাক্য হলে 'নাকি', 'নয়-কি'-সহ জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।

৪. না-সূচক অব্যয় তুলে দিয়ে হ্যাঁ-সূচক অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

৫. সাধারণত বর্তমান কালের 'ল', 'ইল'-ক্রিয়া বিভক্তি থাকলে তার সঙ্গে আগে 'হয়' ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহার করতে হয়।

যেমন:

নেতিবাচক : এতে দোষ নেই।

প্রশ্নবাচক : এতে দোষ কী?

নেতিবাচক : টাকায় সব হয় না।

প্রশ্নবাচক : টাকায় কি সব হয়?

নেতিবাচক : আর পথ নেই।

প্রশ্নবাচক : আর কি পথ আছে?

নেতিবাচক : পুলিশের লোক জানিবে না।

প্রশ্নবাচক : পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?

ঘ. প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. মূল অর্থ বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. প্রশ্নবোধক অব্যয় 'কি' তুলে দিতে হয়।

৩. নেতিবাচক বা নঞর্থক না, নাই, নেই, নি, জানি না, বুঝি না ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

৪. বাক্যটিকে নেতিবাচক ভাব ধারায় গঠন করতে হয়।

যেমন: প্রশ্নবাচক : তারা কি পাষাণ?

নেতিবাচক : তারা পাষাণ কি না জানি না।

প্রশ্নবাচক : এ কেমন কথা?

নেতিবাচক : এ কেমন কথা জানি না।

প্রশ্নবাচক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

নেতিবাচক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

প্রশ্নবাচক : সরস্বতী বর দেবেন কি?

নেতিবাচক : সরস্বতী বর দেবেন না।

ঙ. অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. মৌলিক বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. কর্তার পরে প্রশ্নবাচক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।

৩. ক্রিয়ার পরে নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।

৪. বাক্য শেষে প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক : ফুলকে সকলেই ভালোবাসে।

প্রশ্নবাচক : ফুলকে কি সকলেই ভালোবাসে না?

অস্তিবাচক : এরা অন্য জাতের মানুষ।

প্রশ্নবাচক : এরা কি অন্য জাতের মানুষ নয়?

অস্তিবাচক : শৈশবে তার বাবা মারা যান।

প্রশ্নবাচক : শৈশবে কি তার বাবা মারা যাননি?

অস্তিবাচক : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

প্রশ্নবাচক : বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

চ. প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. প্রশ্নবাচক 'কি' অব্যয় বিলুপ্ত হবে।

৩. নঞর্থক অব্যয় পদও বিলুপ্ত হবে।

৪. জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন স্থানে দাঁড়ি (।) বসাতে হবে।

যেমন: প্রশ্নবাচক : ভুল কি সকলেই করে না?

অস্তিবাচক : ভুল সকলেই করে।

প্রশ্নবাচক : একলা যেতে ভয় করবে না তো?

অস্তিবাচক : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩. সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪. খণ্ডবাক্য ও আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. বাক্যের রূপান্তর বা পরিবর্তন বলতে কী বোঝেন? কী কী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭. বাক্য পরিবর্তন করুন:

ক. শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। (জটিল বাক্য)

খ. যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে শাস্তি পাবে না। (সরল বাক্য)

গ. তুমি দীর্ঘজীবী হও। (বিবৃতিমূলক বাক্য)

ঘ. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক বাক্য)

ঙ. বেশির ভাগ লোকই বেদের অর্থ বুঝত না। (অস্তিবাচক বাক্য)

চ. দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)

ছ. কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়। (নেতিবাচক বাক্য)

জ. এতে দোষ কী? (নির্দেশাত্মক বাক্য)

পাঠ ৫.৩ : ক্রিয়ার কাল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ক্রিয়ার কাল কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়ার কালের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ক্রিয়া অর্থ কাজ। 'কাল' কথাটির অর্থ সময়। ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন–

মায়া ছবি আঁকে– ক্রিয়াটি বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

মায়া ছবি এঁকেছিল– ক্রিয়াটি অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

মায়া ছবি আঁকবে– ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

তাই বলা যায়, কোনো ক্রিয়া বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল। ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথা- ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদঃ ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে কাল (সময়) ও পুরুষবাচক ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। **'সে খেলে'**- এখানে **'সে'** এই নাম পুরুষের জন্য **'খেলে'** ধাতুর সাথে **'এ'** ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে **'খেলে'** ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় লক্ষণীয়–

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। তবে, বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন–

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	আমি যাই	আমরা যাই
মধ্যম	তুমি যাও	তোমরা যাও
নাম	সে যায়	তারা যায়

দেখা যায় যে, খাওয়া ক্রিয়া উত্তম পুরুষে যাই, মধ্যম পুরুষে যাও, নাম পুরুষে যায় অর্থাৎ ক্রিয়ার রূপান্তর হয়েছে; কিন্তু বচনভেদে কোনো রূপান্তর ঘটেনি। একবচনে যাই, বহুবচনেও যাই।

খ. সাধু ও চলিত রীতিভেদে ক্রিয়া বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। যেমন-

	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
সাধু–	পড়ি	পড়িয়াছিলাম	পড়িব
চলিত-	পড়ি	পড়েছিলাম	পড়ব

গ. সাধারণ ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ একই। যেমন–

মধ্যম পুরুষ : তুমি খেলবে। নাম পুরুষঃ সে খেলবে।

ঘ. উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও নাম পুরুষ সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক ও তুচ্ছার্থ- এই তিনটি ক্রিয়ারূপ রয়েছে।

	সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
মধ্যম পুরুষ	তুমি খাও তোমরা খাও	আপনি খান আপনারা খান	তুই খা তোরা খা
নাম পুরুষ–	সে খায় তারা খায়	তিনি খান তারা খান	এটা খায় এগুলো খায়

ক্রিয়ার কালের প্রকারভেদঃ

ক্রিয়া সংগঠনের প্রধান তিনটি কালকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বর্তমান কাল–

ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

ঘ. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

২. অতীত কাল-

ক. সাধারণ অতীত কাল।

খ. ঘটমান অতীত কাল।

গ. পুরাঘটিত অতীত কাল।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

৩. ভবিষ্যৎ কাল-

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল।

ঘ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

বর্তমান কাল

যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে ঘটেছে বা স্বভাবত ঘটে তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান ক্রিয়ার কাল চার প্রকার। এক্ষেত্রে সাথে ই, অ, এ, এন বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন– আমি বই পড়ি।

ক. সাধারণ বর্তমান কালঃ যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন– আমি পড়ি।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালঃ স্বাভাবিক বা অভ্যাস বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন- সকালে সূর্য ওঠে।- স্বাভাবিকতা, আমি রোজ সকালে চা খাই।– অভ্যাস।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগঃ

১. ঐতিহাসিক বর্তমান কাল: অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় যদি নিত্য বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন–

১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

২. স্থায়ী সত্য বা চিরসত্য প্রকাশে: দুই আর তিন পাঁচ হয়।

৩. অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে আজ ফেরি পার হতে পারব কিনা।

৪. কাব্যের ভণিতায়: 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান।'

৫. যদি, যখন, যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে: অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন– বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে : চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

২. অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে): আজ তাহলে উঠি। এখন তবে আসি।

৩. নেই, নাই, নি, শব্দ যোগে অতীত কালের ক্রিয়ায়:

আমি কখনো এরূপ দৃশ্য দেখি নাই।

তিনি গতকাল কলেজে যাননি।

৪. অতীতের কোনো ঘটনাকে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে:

আমি দেখতে পেলাম, কে যেন কাঁদে।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল: যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে চলছে, এখন শেষ হয়নি, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে ছি, ছেন, বা ইতেছি, এতেছে, ইতেছো, এতেছেন যুক্ত হয়। যেমন–

পাখিরা আকাশে উড়ছে।

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. বর্ণনার বিবৃতি প্রকাশ করার জন্যে: দুটো অতীত কালের ক্রিয়ার বর্ণনায় সঙ্গতি রক্ষার জন্য শেষেরটিতে ঘটমান বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন– আমি দেখলাম চোর পালাচ্ছে।

২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে: ভয় পেয়ো না, কালই আসছি।

৩. অতীত ক্রিয়া বর্ণনার সঙ্গতি রক্ষার্থে: বক্তার বিবৃতির বর্ণনীয় বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য কালের ক্রিয়ায় ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন– তিনি বললেন, "পাকিস্তানি শোষকদের অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।"

গ. পুরাঘটিত বর্তমান: যে ক্রিয়ার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজের ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে এছি, এছে, এছো, এছেন বা ইয়াছে, ইয়াছো, ইয়াছেন যুক্ত হয়। যেমন– তিনি বইটি পড়িয়াছেন।

ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা : আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদির ভাব বোঝাতে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে বলে অনুজ্ঞা। আর যে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের অনুজ্ঞা প্রকাশ পায় তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে অ, ও, উন, এন যুক্ত হয়। যেমন-

আদেশ– তোমরা এখনি চলে যাও।

অনুমতি– আপনি ভেতরে আসুন।

অনুরোধ– আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন।

উপদেশ– কখনও মিথ্যা বলবে না।

প্রার্থনা– বেঁচে থাক বাবা।

অতীত কাল

যে সমস্ত সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা পূর্বে শেষ হয়েছে এমন কোনো কাজকে বোঝায়, তাকে অতীত কাল বলে। যেমন- রহমান কাল এসেছিলেন। অতীত কাল ৪ প্রকার। যথা–

ক. সাধারণ অতীত কাল: বর্তমান কালের আগে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালকেই বলে সাধারণ অতীত কাল। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে লাম, ল, লে, লেন ইত্যাদি যুক্ত হয়। যেমন- আমি ছবিটি দেখলাম।

খ. ঘটমান অতীত কাল: যে কাজ অতীতে চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময়ও কাজটি শেষ হয়নি– ক্রিয়া সম্পাদিত হবার এরূপ ভাব বোঝালে তার কালকে ঘটমান অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ল, লে, লাম, লেন যুক্ত হয়। যেমন– সেদিন বিরামহীন বৃষ্টি হচ্ছিল।

গ. পুরাঘটিত অতীত কাল: যে ক্রিয়ার কাজ অতীতে বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং যার পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইয়াছিলাম, ইয়াছিলেন, ইয়াছিল ইত্যাদি যুক্ত হয় যেমন– গত বছর আমি কলকাতা গিয়েছিলাম।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল: অতীতে প্রায়ই ঘটতো এরূপ অর্থে ক্রিয়ার যে, কাল হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইতাম, ইত, ইতেন, ইতে যুক্ত হয়। যেমন– প্রতিদিন সকালে সে গান গাইত।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার:

১. কামনা প্রকাশে: আজ যদি মারিয়া আসতো, কেমন মজা হতো।

২. সম্ভাবনা প্রকাশে: তুমি যদি আসতে, তবে ভালোই হতো।

৩. অসম্ভব কল্পনায়: এই বাড়ি হতো যদি রাজার বাড়ি।

ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়ার কাজটি এখনো ঘটেনি অর্থাৎ অনাগতকালে সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন–মা আগামীকাল আসবেন।

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল: যে ক্রিয়ার কাজ এখনও ঘটেনি, পরে কিংবা অনাগত কালে ঘটবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইব, ইবে, ইবেন হয়। যেমন– শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল: ভবিষ্যতে ঘটতে থাকবে- এরকম বোঝাতে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– যতক্ষণ সে পড়তে থাকবে, ততক্ষণ আমি তাকে বিরক্ত করব না।

নামপুরুষ সাধারণ: -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/ করতে থাকবে)।

নামপুরুষ ও মধ্যম পুরুষ: -ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন) (সম্ভ্রমাত্মক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ: -ইতে থাকিবে/তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক: -ইতে থাকিবে/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উত্তম পুরুষ: -ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার– ইতে/-তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক্ ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য: মূল ধাতুর সঙ্গে- ইতে- তে বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান

ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল: কোনো ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়ে থাকবে, এরকম বোঝালে– সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– আমার কথা হয়তো মনে পড়ে থাকবে। যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক ও গম ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা– গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

ঘ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝালে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের যে রূপ হয়, তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে। যেমন–

আদেশ– এই লেখাটি তুমিই লিখবে।

অনুরোধ– আমার জন্য একটি বই আনবেন।

উপদেশ– মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে।

প্রার্থনা– 'রেখো মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।'

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন- কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে?

২. অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন- ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবী' পড়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ক্রিয়ার কাল কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লিখুন।

২. 'পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।'- উদাহরণের সাহায্যে উক্তিটির বিশ্লেষণ করুন।

৩. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

পাঠ ৫.৪ : কারক ও বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কারকের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তির পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কারক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' (কৃ+নক = কারক) একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। কারক শব্দটির অর্থ– যা কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন– সে আগামী কাল সকালে পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরবে। এই বাক্যে ক্রিয়া 'ধরবে'। ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে সে', কী ধরবে? মাছ; কোথায় ধরবে? পুকুরে জাল দিয়ে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্রিয়ার সঙ্গে নানা কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কগুলিই কারক। ব্যাকরণের পরিভাষায় সম্পর্ককে 'অন্বয়'ও বলা হয়। লক্ষণীয়, বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় সর্বনাম পদের। এগুলোকে নাম পদও বলা হয়।

কারকের সংজ্ঞার্থ

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক বা অন্বয় তাকে বলা হয় কারক।

বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ করে দেয়। দেখা যায় বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন-

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে – সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হল ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থ গ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে 'য়' 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়, 'এ' হল বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোন বর্ণ যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণ মতে সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০)। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির সজ্জা এই রকম,

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে
সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি।

অনেক সময় বাক্যে বিভক্তির বদলে বিভক্তি স্থানীয় শব্দও ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিভক্তিরই কাজ করে। যেমন–
আমি ছেলেগুলিকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম।
কিংবা, সে ঢাকা থেকে এসেছে।

উপরের দুটি বাক্যে 'দিয়ে' ও 'থেকে' বিভক্তি স্থানীয় শব্দ। এগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। তাহলে অনুসর্গের সংজ্ঞা হল,

বাংলা বাক্যে যে অব্যয়জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে বিভক্তির ন্যায় বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় অনেক বাক্য রয়েছে যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন–

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।
ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এই জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সেজন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। উপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। 'মাঠ মাঠ অজস্র ফসল কিংবা' 'ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদী ভাসমান' বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে 'এ' বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে 'তে' বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। 'গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে'– এই বাক্যে আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও 'য়' বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য করেছে। নতুবা গাছ পাতা রাত শিশির' কোন বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সেজন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সে সব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো যেমন 'দ্বারা' 'দিয়ে' 'কর্তৃক', 'হতে', 'থেকে, চেয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলা বিভক্তি

বাংলা বিভক্তিগুলি নিম্নরূপ

১) শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি (২) এ-বিভক্তি
৩) 'তে' বিভক্তি ৪) 'কে' বিভক্তি
৫) 'রে' বিভক্তি

এই বিভক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম চারটি বাক্যের কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়; শেষেরটি অর্থাৎ 'র' বা 'এর' বিভক্তি সম্বন্ধ পদ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলায় প্রত্যেক কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বাংলা বিভক্তিগুলি কমবেশি প্রায় প্রত্যেক কারকে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য বিভক্তি দিয়ে বাংলা কারক চেনা যায় না, বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদগুলোর অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলোর সম্বন্ধ স্থির করে বাংলা কারক নির্ণয় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিভক্তিগুলোর এক বচন রূপ আছে, বহুবচন নেই। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে একই বিভক্তি দেখা যায়। বহুবচনের চিহ্ন জ্ঞাপক কিছু বর্ণ সমষ্টি দেখা যায়, সেগুলি বহুবচনের রূপ মাত্র, বিভক্তি নয়। যেমন–

মানুষ+গুলো+কে = মানুষগুলোকে; এখানে বিভক্তি 'কে', গুলো বিভক্তি নয়।
নদী+গুলো+তে = নদীগুলোতে; এখানে বিভক্তি 'তে'।
প্রত্যেক কারকের জন্য বিভক্তিকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো

বিভক্তির নাম	বিভক্তির রূপ	বহুবচন
প্রথমা	শূন্য (০), অ	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া	কে, রে (এরে)	দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা
চতুর্থী	কে, রে (এরে) [দ্বিতীয়ার মতো]	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]	দিগ হতে, দিগের চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগেরে, দের, দিগে, দিগেতে, গণে
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক বলতে কী বোঝায়? কারকের সংজ্ঞার্থ দিন।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কেন ব্যবহৃত হয়?

৩. বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো কী? এগুলোর কী কাজ?

৪. বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখুন।

৫. বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান- কথাটি বুঝিয়ে দিন।

৬. বাংলা বিভক্তিগুলির পরিচয় দিন।

৭. বুঝিয়ে দিন– শূন্য (০) বিভক্তি, অনুসর্গ

পাঠ ৫.৫ : কারকের বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কারক কত প্রকার ও কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক কারকের সংজ্ঞার্থ ও বিবরণ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তিগুলোর প্রয়োগ করতে পারবেন।

কারকের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদের অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। বাংলা বাক্যগুলোতে দেখা যায় এই সম্পর্ক ছয় প্রকারের হতে পারে। সেজন্য কারক ছয় প্রকার। যেমন–

১. কর্তৃকারক
২. কর্মকারক
৩. করণ কারক
৪. সম্প্রদান কারক
৫. অপাদান কারক
৬. অধিকরণ কারক

নিচের ছোট ছোট প্রশ্ন ব্যবহার করে সহজেই কারক নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্নসমূহ	**কারকের নাম**
কে, কার?	কর্তৃকারক
কী করে?	কর্মকারক
কাকে? / কার জন্যে?	সম্প্রদান কারক
কোথা থেকে?	অপাদান কারক
কী দিয়ে?	করণ কারক
কোথায় করে? কখন?	অধিকরণ কারক

যেমন : বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

প্রশ্নসমূহ	**কারকের নাম**
কে দেয়?	বেগম সাহেবা (কর্তৃকারক)
কী দেয়?	চাল (কর্মকারক)
কী দিয়ে দেয়?	হাত (করণকারক)
কোথা থেকে দেয়?	ভাঁড়ার (অপাদান কারক)
কাকে দেয়?	গরিবকে (সম্প্রদান কারক)
কখন দেয়?	প্রতিদিন (অধিকরণ কারক)

কর্তৃকারক

বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় কর্তা এবং এই কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কর্তৃকারক।

'উপমা পড়ছে' এই বাক্যে উপমা হল কর্তা।

ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। সাগর দৌড়াচ্ছে – কে দৌড়াচ্ছে? সাগর। সুতরাং 'সাগর' কর্তৃকারক। তারা হাঁটছে – কারা হাঁটছে? তারা। 'তারা' কর্তৃ কারক।

নানা রকম কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় বাক্যের কর্তা কয়েক রকম।

ক) মুখ্য কর্তা ঃ যে বা যারা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বা তাদের বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন–

শৈলী রান্না করছে।

কৃষকেরা ফসল কাটছে।

এখানে 'শৈলী ও 'কৃষকেরা' মুখ্য কর্তা

খ) প্রযোজক কর্তা ঃ মুখ্য কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায় তখন মুখ্য কর্তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা। যেমন,

কৃষক গরু দিয়ে চাষ করায়।

এই বাক্যে 'কৃষক' প্রযোজক কর্তা।

গ) প্রযোজ্য কর্তা ঃ যাকে দিয়ে মুখ্য কর্তার কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা।

মিতা ছোট বাচ্চাটিকে হাঁটাচ্ছে।

এখানে 'বাচ্চাটি' হল প্রযোজ্য কর্তা।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে আরো কয়েক রকম কর্তার রূপ বোঝা যায়। যেমন-

কর্মবাচ্যের কর্তা – আমাকে যেতে হবে।

ভাববাচ্যের কর্তা – তার বোধ হয় খাওয়া হয়নি।

কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা– ঝড় আসছে। বাড়িগুলো ভেঙে পড়বে।

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ কর্তৃকারকে সাধারণত শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য বিভক্তির ব্যবহারও রীতিসিদ্ধ। যেমন–

কর্তৃকারকে শূন্য (০)

বা অ-বিভক্তি	ঃ	মিতা খেলছে।
এ-বিভক্তি	ঃ	শাড়িটি চোরে নিয়ে গেছে।
য়-বিভক্তি	ঃ	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি	ঃ	পাখিতে ধান খেয়েছে।
কে-বিভক্তি	ঃ	আমাকে যেতেই হবে।
র-বিভক্তি	ঃ	শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হল না।
দ্বারা (অনুসর্গ)	ঃ	তোমা দ্বারা এ কাজ হবে না।
কর্তৃক (অনুসর্গ)	ঃ	নজরুল কর্তৃক অগ্নি-বীণা রচিত হয়েছে।

কর্মকারক

কর্তা যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্ম এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধই কর্মকারক।

সে ফল কিনছে – সে কী কিনছে? ফল। সুতরাং ফল কর্মকারক।
সায়েমা অর্ককে মারছে – সায়েমা কাকে মারছে? অর্ককে। 'অর্ক', কর্মকারক।

কোনো কোনো ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর একটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম অন্যটি গৌণ কর্ম। বোঝাই যায়, গৌণ কর্মের চেয়ে মুখ্য কর্মের গুরুত্ব বেশি। মুখ কর্ম দিয়েই ক্রিয়ার কাজ পূর্ণ হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম ব্যক্তিবাচক বা প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। যেমন–

শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।
এই বাক্যে 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম, ছাত্র গৌণ কর্ম।

কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ
সাধারণত কর্মকারকে কে, রে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ হয়।

কর্মকারকে শূন্য (০) বা অ বিভক্তি– সে বই পড়ে।
কর্মকারকে কে-বিভক্তি – আমার ছেলেকে বকবে না।
কর্মকারকে রে-বিভক্তি – তারে ডেকে আন।
কর্মকারকে য়-বিভক্তি – তোমায় আমি চাই।
কর্মকারকে এ-বিভক্তি – বৃথা গঞ্জ দশাননে
কর্মকারকে র-বিভক্তি – আমার দেখা পাবে না।

করণ কারক
যার দ্বারা বা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে।

'করণ' শব্দের অর্থ উপায় বা সহায়। বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কার দ্বারা' বা কী উপায়ে জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই করণ কারক।
নীলু ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। – নীলু কী দিয়ে ঘর সাজায়? ফুল দিয়ে সুতরাং 'ফুল' করণ কারক।
কাঠুরে কুড়াল দ্বারা গাছ কাটে। – কাঠুরে কী দ্বারা গাছ কাটে? কুড়াল দ্বারা। 'কুড়াল' করণ কারক।
করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ – করণ কারকে সাধারণত দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির (অনুসর্গের) ব্যবহার হয়। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ রয়েছে।
করণ কারকে 'দ্বারা বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে।
করণ কারকে 'দিয়া' বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমার লোক দিয়ে কাজটা করাবে।
করণ কারকে শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি – রফিক তাস খেলে।
করণ কারকে এ-বিভক্তি – গ্যাসে গাড়ি চলে।
করণ কারকে য়-বিভক্তি – টাকায় টাকা হয়।
করণ কারকে তে-বিভক্তি – তার কথা যেন মধুতে মাখা

সম্প্রদান কারক
যার জন্য বা যার উদ্দেশে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দেওয়া যায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

গরীবের মেয়েটিকে ভাত দাও। – এই বাক্যে গরীবের মেয়েটিকে সম্প্রদান কারক।
আধুনিক ব্যাকরণবিদেরা সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে এটি কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। তবু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক আছে।
সম্প্রদান কারকে কে, রে চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার হয়। অন্য দু'একটি বিভক্তিরও প্রয়োগ রয়েছে।
সম্প্রদান কারকে কে-বিভক্তি - তাঁকে আমার সালাম জানাবে।

সম্প্রদান কারকে রে-বিভক্তি - হে দেবতা, তোমারে করব না পূজা।
সম্প্রদান কারকে এ-বিভক্তি - ঘরহীনে ঘর দাও।
সম্প্রদান কারকে য়-বিভক্তি - তোমায় কেন দিইনি আমি, সকল শূন্য করে।
সম্প্রদান কারকে তে-বিভক্তি - সমিতিতে চাঁদা দিয়েছি।
সম্প্রদান কারকে র-বিভক্তি - আল্লাহর এবাদত কর।

অপাদান কারক

যা থেকে বা যা হতে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ক্রিয়ার বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে তাকে অপাদান কারক বলে।

লাবলু সেদিন ঢাকা থেকে চাঁটগা গিয়েছিল। - এ বাক্যে 'যাওয়া' ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।
আখ হতে গুড় হয়। - এই বাক্যে গুড় হওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় 'আখ' হতে।
সুতরাং 'ঢাকা' ও 'আখ' অপাদান কারক।
অপাদান কারকে ক্রিয়া সম্পাদনের আরও কিছু নমুনা

স্থান — বাসের ছাদ থেকে সে পড়ে গেল।
কাল — পরশু থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি, খুব জ্বর।
অবস্থা — কোথাও হতে আশ্বাস পাব বলে মনে হয় না।
দূরত্ব — ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব একশ কিলোমিটারের মতো।
তারতম্য — সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ

অপাদান কারকে সাধারণত 'হতে', থেকে, চেয়ে' ইত্যাদি বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের ব্যবহার হয়। অপরাপর বিভক্তিগুলোর প্রয়োগও অপাদান কারকে রয়েছে।
অপাদান কারকে 'হতে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - সরষে হতে তেল হয়।
অপাদান কারকে 'থেকে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - কোথা থেকে এসেছে
অপাদান কারকে 'চেয়ে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - ফরিদের চেয়ে মুরিদ বয়সে বড়
অপাদান কারকে শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি - সে একজন জেল পলাতক আসামি।
অপাদান কারকে এ-বিভক্তি - বিপদে মোরে রক্ষা কর।
অপাদান কারকে য়-বিভক্তি - পড়ায় বিরত হয়ো না।
অপাদান কারকে তে-বিভক্তি - জমিতে বেশ ধান পেয়েছি।
অপাদান কারকে কে-বিভক্তি - ছোট মামাকে বড় ভয় পাই।
অপাদান কারকে র-বিভক্তি - জঙ্গলে সাপের ভয় আছে।
বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার
ক. স্থানবাচক : তিনি গাজীপুর থেকে এসেছেন।
খ. দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
গ. নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক : যে 'সময়' বা 'স্থান' কে আশ্রয় করে কর্তা তার কর্ম সম্পাদন করে সেই সময় বা স্থানকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণ কারকে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

যেমন: ১. দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেও তারে।
২. নদীতে নৌকা বাঁধা।
৩. বসন্তে কোকিল ডাকে।

এখানে যদি প্রশ্ন করা যায় প্রার্থী কোথায় দাঁড়িয়ে তাহলে উত্তর আসে–দুয়ারে। আর দুয়ারে একটি স্থান।

আবার যদি বলা যায় কোকিল কখন ডাকে তাহলে উত্তর পাওয়া যায় বসন্তে। আর 'বসন্ত' সময় নির্দেশ করে।

শ্রেণিবিভাগ : অধিকরণ কারক তিন প্রকার।

যেমন: ১. আধারাধিকরণ,
২. কালাধিকরণ ও
৩. ভাবাধিকরণ।

১. আধারাধিকরণ : 'আধার' অর্থ 'স্থান'। অর্থাৎ, কর্তা কর্ম সম্পাদনে যে স্থানটি ব্যবহার করে, তাকে আধারাধিকরণ বলে।

যেমন: ১. আকাশে চাঁদ আছে।
২. ছেলেরা মাঠে খেলা করে।

২. কালাধিকরণ : 'কাল' অর্থ সময়। বাক্যের কর্তা যে সময়ে কাজ করে, সেই সময়কে কালাধিকরণ বলে।

যেমন: ১. তারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে।
২. বৈশাখ মাসে নবান্ন উৎসব হয়।

৩. ভাবাধিকরণ : কোনো ক্রিয়া সম্পাদন যদি অন্য কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ওপর নির্ভর করে, তাকে ভাবাধিকরণ বলে। যেমন: ১. সূর্যোদয়ে চারদিক আলোকিত হয়।
২. আহারে পেট ভরে।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :

১. প্রথমা বিভক্তি - শফিক সিলেট থাকে।
২. দ্বিতীয় বিভক্তি - হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।
৩. তৃতীয়া বিভক্তি - বড় রাস্তা দিয়ে যেও।
৪. পঞ্চমী বিভক্তি - এমন দিনে কি বলা যায় তারে।

কারক নির্ণয়ের সহজ নিয়মাবলি :

১. কর্তৃকারক : বাক্যের ক্রিয়াকে 'কে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তৃকারক পাওয়া যায়। যেমন: সবিতা গান গায়। কে গান গায়? উত্তর হবে 'সবিতা'। এখানে সবিতা কর্তৃকারকের উদাহরণ।

২. কর্মকারক : বাক্যে অবস্থিত ক্রিয়াপদকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্মকারক পাওয়া যায়। যেমন:
   ১. সে ভাত খায়। এখানে 'ভাত' কর্মকারকের উদাহরণ। কারণ 'কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর 'ভাত' পাওয়া যায়।
   আবার,
   ২. বাবা আমাকে একটি কলম দিয়ে দিলো। এখানে, যদি প্রশ্ন করি, 'কাকে' দিলো। তাহলে উত্তরে 'আমাকে' পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে 'আমাকে' কর্মকারক।

৩. করণকারক : 'কীসের দ্বারা' কর্তা কাজ করে প্রশ্ন করলে করণকারক পাওয়া যায়। যেমন: টাকায় টাকা হয়। এখানে যদি প্রশ্ন করি কীসের দ্বারা টাকা হয়, তাহলে উত্তর হবে টাকার দ্বারা। সুতরাং, 'টাকা' এখানে করণকারকের উদাহরণ।

৪. সম্প্রদান কারক : স্বত্বত্যাগ করে কর্তা যদি কারোর জন্য কিছু করে তবে যার জন্য করে, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। অর্থাৎ, "কার জন্য করে" প্রশ্ন করলে সম্প্রদান কারক পাওয়া যায়। যেমন: ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। এখানে, ভিক্ষা দেওয়ার কাজটি করা হয়েছে ভিখারির জন্য। সুতরাং ভিখারি এখানে সম্প্রদান কারক।

৫. অপাদান কারক : "কোথা থেকে" কাজটি হচ্ছে প্রশ্ন করলে অপাদান কারক পাওয়া যায়। যেমন: ছাদ থেকে পানি পড়ে। যদি বলি "কোথা থেকে" পানি পড়ে, তাহলে 'ছাদ' উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং 'ছাদ' এখানে অপাদান কারক।

৬. অধিকরণ কারক : কোথায় বা কখন হচ্ছে" প্রশ্ন দ্বারা অধিকরণ কারক পাওয়া যায়। যেমন: বনে বাঘ আছে। যদি বলি বাঘ কোথায় আছে, তাহলে 'বনে' উত্তর পাওয়া যায়।
   আবার, মাঘ মাসে প্রচণ্ড শীত হয়।

এখানে, যদি বলি কখন প্রচণ্ড শীত হয়, তাহলে "মাঘ মাস" উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং 'বনে' ও 'মাঘ মাস' এখানে অধিকরণ কারক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক কয় প্রকার ও কী কী?
২. কর্তৃকারকের সংজ্ঞা লিখুন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৩. কতো রকম কর্তৃকারক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিন।
৪. কর্মকারক কাকে বলে? কোনটি মুখ্য কর্ম আর কোনটি গৌণ কর্ম?
৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৬. একই রকম মনে হলেও কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লিখুন।
৭. উদাহরণসহ অপাদান কারকের সংজ্ঞা দিন এবং অপাদান কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখান।
৮. অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার অধিকরণের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৯. সকল কারকে শূন্য (০) বিভক্তির প্রয়োগ দেখান।
১০. সকল কারকে 'এ' বিভক্তির (৭মী বিভক্তির) প্রয়োগ দেখান-
১১. সকল কারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখান
১২. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন ঃ

নিজের সাধনায় বড় হও।
সে কানে শোনে না।
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কেন?
গরিবকে সাহায্য কর।
আমাকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে।
জোর হাওয়ায় বাড়িটি নড়ছে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক বেঁধেছে।
তুমি কখন এসেছ?
অনেকেই আমেরিকা যায়।
আল্লাহকে ডাক।
শুনেছি লোকটি বিলেত ফেরত।
ভোরে বাড়ি থেকে বের হলাম।
লোকে কী বলবে।
লেখাপাড়ায় মনোযোগী হও।
চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
ফাগুনের শুরুতে কোকিল ডাকে।
সারাটা দিন কলেজ পালিয়ে কোথায় ছিলে ?
লীলা রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
সে বাগানে ফুল তুলছে।
বশির চমৎকার ফুটবল খেলে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
চোরকে বেত মারা হল।
চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয়।
ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।

তুমি বই পড়।
চোরের ভয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছি।
তোমার খাওয়া হল না ।
পাগলেতে কী না বলে।
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করে।
এ কলমে ভাল লেখা হয় না।
গগনে গরজে মেঘ।
গাধায় পানি ঘোলা করে খায়।
বোঁটা খসা ফল গাছে থাকবে কী করে?
ছুরি দিয়ে ফল কাট।
পাঁচ দিন ঘুমাতে পারিনি।
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।
রাতভর বৃষ্টি হল।
সে জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে।
একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
তিমি মাছ সাগরে থাকে।
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।
আজকাল অনেক গাড়ি গ্যাসে চলে।
তর্কে বিরত হও।
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হজরত।
সাগরতীরে বসে আছি।
কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে।
পূজার ফুল কে তুলবে?
ছাগলেতে কী না খায়।
আমি জানি কত ধানে কত চাল হয়।

পাঠ ৫.৬ ঃ সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্বন্ধ পদ

বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না এমন কোন পদের সঙ্গে নামপদের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ দেখা যায় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

আমি তোমার বাড়ি যাব। এই বাক্যে যাব ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'আমি' ও 'বাড়ি' এই দুটি নাম পদের কিন্তু তোমার পদের সঙ্গে 'যাব' পদের কোন সম্পর্ক নেই; 'তোমার' পদটি 'বাড়ি'র সম্বন্ধীয় এবং বিশেষণজ্ঞাপক। এ কারণে 'তোমার' সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোন সম্বন্ধ বা অন্বয় না থাকার কারণে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-
আমি+র>আমার (মা)
তুমি+র > তোমার (ছোট বোন)
বাড়ি+র > বাড়ির (লোক)
মাথা+র > মাথার (চুল)
জাফর+এর > জাফরের (গাড়ি)
সাগর+এর > সাগরের (ঢেউ)
খেত+এর > খেতের (চাল)
ডিম+এর > ডিমের (খোসা)
ভোর+এর > ভোরের (কাগজ)
স্থান, কাল, দিক ইত্যাদি বাচক কিছু শব্দের সঙ্গে 'র' বা 'এর'-এর পরিবর্তে সম্বন্ধসূচক 'কার' >কের ব্যবহৃত হয়।

আজি+কার = আজিকার>আজকের (খবর)
কালি+কার = কালিকার > কালকার> কালকের (কথা)
আগে+কার = আগেকার (দিন)
কখন+কার = কার = কখনকার (ঘটনা)
ভিতর+কার = ভিতরকার (অবস্থা)
পূর্বদিক+কার = পূবদিককার (অংশ)

বাংলা ভাষায় সম্বন্ধ পদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো ব্যক্তির বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে। নানা অর্থে সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল –

১. অধিকার সম্বন্ধ : বাংলাদেশের জলভাগ, আমার বাড়ি, তোমার ঘড়ি।
২. সামীপ্য : পুকুরের পাড়, সাগরের তীর
৩. অঙ্গ : ঘরের ছাদ, শিশুর দাঁত

৪. কার্যকারণ : আগুনের তাপ, আঘাতের বেদনা
৫. নিমিত্ত : পরের দুঃখ, বিয়ের সাজ
৬. উৎপাদন : জমির ধান, ফার্মের মুরগি।
৭. গুণ সম্বন্ধ : পাকা আমের মিষ্টতা, রান্না গোসতের স্বাদ
৮. হেতু সম্বন্ধ : বিদ্যার বিনয়, রূপের অহংকার
৯. উপাদান সম্বন্ধ : সোনার হার, পিতলের বাটি
১০. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : ইদের ছুটি, দুই দিনের পথ।
১১. ক্রম সম্বন্ধ : সাতের পৃষ্ঠা, বারোর ঘর
১২. কৃতিত্ব সম্বন্ধ : রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', নজরুলের 'অগ্নিবীণা'
১৩. বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের কথা, ভিক্ষার চাল
১৪. অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ : হৃদয়ের আসন, শোকের ছায়া।
১৫. কারক সম্বন্ধ :
কর্তা - আমার পড়া
কর্ম - গরিবের সেবা
করণ - লাঠির আঘাত
অপাদান - বাঘের ভয়
অধিকরণ - গ্রামের মানুষ

সম্বোধন পদ

আহ্বান বা সম্ভাষণ করে কিছু বলা হলে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন পদ বলে।

এই যে করিম, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এই বাক্যের বক্তা করিম নামক জনৈক মানুষকে সম্বোধন করছে। সেজন্য করিম সম্বোধন পদ। এই যে, অব্যয় জাতীয় শব্দ। এ জাতীয় বহু সম্বোধন সূচক অব্যয় শব্দ সম্বোধন পদের আগে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
ওহে বাপু, কী করছ?
হে মানুষ, নিজের কথা ভাবো!
ওগো বন্ধু, কেমন আছো?
ওরে দুষ্টু, তোর মনে এই ছিল?
কী রে ভাই, আমার কথা একেবারে ভুলে গেলে!

বাংলা ভাষায় একসময় সম্বোধন পদের আগে অয়ি, অরে, আলো, ওলো, গো, লো, হাঁগো, হ্যাঁগা, হ্যাদে ইত্যাদি প্রাচীন অব্যয়গুলো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় এগুলোর ব্যবহার বেশ কমে এসেছে। সম্বোধনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহ্য রেখে শুধু অব্যয় ব্যবহার করেও সম্বোধন বাক্য তৈরি করা যায়। যেমন–
কী, তুমি যাবে?
কী রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?
এই, তুই কিন্তু দেরি করবি না।
কই, আমার কথা শুনছ?
হ্যাঁরে, তোদের এখানে কি কোন ভালো মানুষ নেই?
সম্বোধন সূচক অব্যয় বাদ দিয়ে শুধু সম্বোধন পদ দিয়ে বাক্য রচনা আধুনিক বাংলা রীতি। যেমন–

আপা, আমাকে ছুটি দিন।
ভাই, কেমন আছো, তোমাকে বহুদিন দেখিনি

রশিদ, তুমি তো আমার কোনো কথা শোন না।
স্যার, একটা কথা শুনবেন।
খোদা, তার দিলে রহম দাও।

তৎসম শব্দে সম্বোধন পদে পরিবর্তন হয়; কিন্তু আধুনিক বাংলায় এ রকম ব্যবহার রীতিসিদ্ধ নয়। যেমন-
হে মাতা, সন্তানকে ভুলে গেলি।

সম্বোধন পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। সেজন্য সম্বোধন পদও কারক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? সম্বন্ধ পদের সংজ্ঞা দিন।
২. সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন? বুঝিয়ে দিন।
৩. সম্বন্ধ পদ কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৪. সম্বোধন পদের সংজ্ঞা দিন।
৫. সম্বোধন পদ কেন কারক নয় তার কারণ লিখুন।
৬. কয়েকটি সম্বোধন সূচক অব্যয় পদ লিখুন।
৭. কোনটি সম্বন্ধ পদ এবং কোনটি সম্বোধন পদ নির্দেশ করুন।
   ক. তোমার ছোট ভাইটিকে বেশ মেধাবী মনে হল।
   খ. পাটের গুদামে আগুন লেগেছে।
   গ. ওরে আজ তোরা ঘরের বাইরে যাবি নে।
   ঘ. শাহাদাত, তোমার মনে এই ছিল।
   ঙ. সে তো ননীর পুতুল। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে।
   চ. একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে চাই।
   ছ. নদীর পানি একেবারেই কমে গিয়েছে।
   জ. বদমাশ। তোকে আজ আমি দেখে নেব।
   ঝ. সে আজ কতকালের কথা।
   ঞ. দেখছ না, লোকটা কেমন দৃষ্টিতে তাকাল!
৮. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তির ব্যবহার হয়? ঐ বিভক্তির প্রয়োগে দশটি সম্বন্ধ পদ তৈরি করুন।

পাঠ ৫.৭ : উক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উক্তির সংজ্ঞার্থ এবং প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য কী তা বলতে পারবেন।

কোনো কিছু বলার নাম উক্তি।

উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি

প্রত্যক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার নিজের কথাই অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে।
যেমন :

১. বারেক বলল, "আজ সাত দিন যাবৎ আমি টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি।"
২. তিনি বলিলেন "আজই আমার কোর্টে যাওয়া দরকার।"
৩. আয়েশা বলল, "এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর"।
৪. কপালকুণ্ডলা বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, আইস পথ দেখাইয়া দিতেছি।"
৫. নবীন বলল, "আমি কলেজে যাব"

পরোক্ষ উক্তি

বক্তার নিজের কথার যথাযথ উল্লেখ না করে যদি অন্য ব্যক্তি নিজের কথায় তা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।

যেমন :

১. কালাম বলল যে, সে আজই সাভার যাবে।
২. তনু বলল যে, তার অসুখ করেছে।
৩. আনোয়ার বলল যে, তার বাবা-মা দুজনেই দেশের বাইরে আছেন।
৪. অভ্র বলল যে, সে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে।
৫. শিলা বলল যে, সে ছবি আঁকবে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম :

১ প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু (" ") উদ্ধার চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন লোপ সাধন করতে হয় এবং উদ্ধার চিহ্ন স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বক্তব্যের মধ্যে বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :

প্রত্যক্ষ উক্তি : আমেনা বলল, "আমার ভাই বাড়ি নেই।"
পরোক্ষ উক্তি : আমেনা বলল যে, তার ভাই বাড়ি ছিলেন না।

২. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : আলিম বলল, "আমার বাবা আজই ঢাকা যাচ্ছেন"।
পরোক্ষ উক্তি : আলিম বলল যে, তার বাবা সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : হেলাল স্যার বললেন "কাল তোমাদের ক্লাস ছুটি থাকবে।"
পরোক্ষ উক্তি : হেলাল স্যার বললেন, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

৫. অর্থ-সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : আজাদ বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।"
পরোক্ষ উক্তি : আজাদ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খণ্ড বাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না। যেমন–
ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** ফারুক লিখেছিল, "বগুড়ায় খুব শীত পড়েছে"।
পরোক্ষ উক্তি : ফারুক লিখেছিল যে, বগুড়ায় খুব শীত পড়েছিল।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** জামাল বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : জামাল বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।
গ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** মইন বলল, "আমি সিলেট যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : মইন বলল যে, সে সিলেট যাবে।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–
ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** শিক্ষক বললেন, 'পৃথিবী গোলাকার'।
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** বৈজ্ঞানিক বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"
পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৮. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রশ্নবোধক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** শিক্ষক বলেন, "তোমরা ছুটি চাও?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ছুটি চাই কিনা শিক্ষক তা জিজ্ঞেস করলেন।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** মা বললেন, "কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে মা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** জলি বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"
পরোক্ষ উক্তি : জলি তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** তিনি বললেন, "দয়া করে বাইরে আসুন।"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন।
পরোক্ষ উক্তি : বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল যে, শীতে তারা কতই না কষ্ট পাচ্ছে।

আবেগসূচক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** ফরিদা বলল, "বা"! ফুলটি খুব সুন্দর।"
পরোক্ষ উক্তি : ফরিদা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, ফুলটি খুব সুন্দর।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল যে, শীতে তারা অনেক কষ্ট পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. উক্তি কাকে বলে? উক্তি কত প্রকার ও কী কী?
২. উক্তি পরিবর্তনের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।
৩. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করুন।
ক. শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।"
খ. নাসিমা বলল, "আমি এখানে কিছুদিন থাকব।"
গ. মা বললেন, "আগামীকাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"
ঘ. লোকটি বলল, "বাঃ! দৃশ্যটি খুব সুন্দর।"
৪. পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করুন–
ক. আমির বলল যে, তার ভাই একজন খেলোয়ার।
খ. ছেলেটি আনন্দের সাথে বলল যে, প্রজাপতিটি বড়ই সুন্দর।
গ. রহমান আমাকে পরদিন আসতে বলল।
ঘ. বক্তা বললেন যে, ঋতু পরিবর্তনশীল।

পাঠ ৫.৮ : বাচ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাচ্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাচ্য কত প্রকার ও কী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম লিখতে পারবেন।

evP¨

'বাচ্য' শব্দের অর্থ বক্তব্য। বক্তব্য বিষয়টিতে যখন কর্তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন বাক্যটি কর্তৃবাচ্যের, যখন কর্ম প্রাধান্য লাভ করে, তখন কর্মবাচ্যের এবং যখন ক্রিয়াপদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন ভাববাচ্যের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন–

১. **সেলিনা** স্কুলে যাচ্ছে।
২. পুলিশের গুলিতে **ডাকাত** আহত হয়েছে।
৩. আবুলের বাড়ি **যাওয়া** হলো না।

উপরিউক্ত প্রথম বাক্যে কর্তার, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিই বাচ্য।

বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

বাংলাভাষায় বাচ্য চার প্রকার। যথা-
ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য, গ. ভাববাচ্য, ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন- অভি বই পড়ছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সবসময় কর্তার অনুসারী হয়। অর্থাৎ কর্তার যে পুরুষ ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়ে থাকে। যেমন– শিলা কাজ করছে, সোহাগ খেলা করছে।
২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন–
   ক) তাকে খেতে বলেছি।
   খ) শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।
   গ) রোগী পথ্য সেবন করে।
   ঘ) চোর আমগুলো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।
   ঙ) কাঠুরে বনে কাঠ সংগ্রহ করছে।

কর্মবাচ্য

যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষের, ক্রিয়াটিও যদি সেই পুরুষের হয়, তবে তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– পাহারাদার কর্তৃক চোর ধরা পড়েছে।

১. কর্মবাচ্যে, কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা, দিয়া (দিয়ে) কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন–
   ক) আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়।

খ) চোরটা ধরা পড়েছে।
গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।
ঘ) আজ গান শোনা হবে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন–
ক) আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।
খ) আলমকে ডাক।
গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।

ভাববাচ্য

যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে থাকে। যেমন-
ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) বাড়ি যাওয়া হলো না (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) ঢাকা যেতে হবে। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
গ) তোমার দ্বারা (কর্তায় তৃতীয়া) এ কাজ হবে না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্মের দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–
ক) এ পথে চলা দুষ্কর।
খ) এবার ওঠা যাক।
গ) কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূলক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে বাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–
ক) এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা অনুচিত।
খ) এ পথ আমার চেনা নেই।
গ) মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।
ঘ) জিজ্ঞাসিলে কহিবারে পারি, জানো তো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।

কর্ম-কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মকারক কর্তার মতো প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম কর্তার মনোযোগ ব্যতীত সম্পাদিত হয়, তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন–
ক) আম পেকেছে খুব।
খ) তাঁর বইটি বাজারে বেশ কাটছে।
গ) অব্যয় বাঁশি বাজায়।
ঘ) কাপড় ছেঁড়ে।
ঙ) তোমাকে রোগা দেখায়।

সাধারণত প্রাকৃতিক ঘটনামূলক ক্রিয়ায় এই বাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য :

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–
ক) বাক্য পরিবর্তনের অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।
খ) কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হবে।
গ) কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়।

জ্ঞাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
ক) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	ক) বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
খ) ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	খ) বিশ্বজগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।
গ) আনন্দময়ী পুস্তক পাঠ করছে।	গ) আনন্দময়ী কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্য ব্যবহৃত তৎসম ক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য :

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে

ক) কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

খ) ক্রিয়া নামপুরুষ অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
ক) আমি কোথাও যাবো না।	ক) আমার যাওয়া হবে না কোথাও।
খ) তুমিই রাজশাহী যাবে।	খ) তোমাকেই রাজশাহী যেতে হবে।
গ) তোমরা কখন এলে।	গ) তোমাদের কখন আসা হল।

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য :

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

ক) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয় বা শূন্য বিভক্তি হয়ে থাকে।

খ) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্মবাচ্য	কর্তবাচ্য
ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	ক) দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
খ) শিক্ষক কর্তৃক সে জ্ঞানী হয়েছে।	খ) শিক্ষক তাকে জ্ঞানী করেছে।

ভাব বাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করার সময়–

ক) কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হবে।

খ) ক্রিয়াপদটি কর্তা অনুযায়ী হবে।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
ক) তোমাকে পাশ করতে হবে।	ক) তুমি পাশ করবে।
খ) এবার একটি গান করা হোক।	খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
গ) তার যেন আসা হয়।	গ) সে যেন আসে।
ঘ) চা পান করা হোক।	ঘ) (তুমি) চা পান কর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বাচ্য কাকে বলে? বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

খ. বাচ্যান্তর করুন

১. কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করুন।

ক. আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।

খ. মহাকবি ফেরদৌসি শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।
গ. শিকারি বাঘ মেরেছে।
ঘ. আমি বইটি পড়েছি।

২. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করুন।
ক. কাফেলা দুস্যদল দ্বারা আক্রান্ত
খ. স্থপতি ইসা বুমির তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।
গ. মধুসূদন কর্তৃক **মেঘনাদবধকাব্য** রচিত হয়েছিল।

৩. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাব বাচ্যে এবং ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করুন
ক. এবার একটি কবিতা আবৃত্তি হোক।
খ. আমি একাই খাব।
গ. আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।
ঘ. ধর্মস্থানে বেয়াদবি করতে নেই।

৪. বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুদ্ধ করুন :
ক. তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।
খ. ছাত্রগণ তোমাদিগকে কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শোনা হউক।
গ. শাসন করা তাই সাজে, সোহাগ করে যে।
ঘ. আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজে।
ঙ. মাতা কর্তৃক একটি কলম দান করা হইয়াছি।